আমরা করব জয়

একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, "God created the world, but the Dutch created the Netherlands." 'স্রষ্টা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আর ডাচেরা নেদারল্যান্ডস সৃষ্টি করেছে'। 'নেদারল্যান্ডস' দেশটি বর্হিবিশ্বের অনেকের কাছে 'হল্যান্ড' নামেও পরিচিত। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নেদারল্যান্ডসের উত্তর পশ্চিম ভাগ 'প্রভিনস হল্যান্ড' অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রচন্ড প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল, সে কারণে তখন বর্হিবিশ্ব 'নেদারল্যান্ডস' কে 'হল্যান্ড' নামেই জানতো, 'উত্তর হল্যান্ড' আর 'দক্ষিন হল্যান্ড'। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়ন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিদায় নেয়ার পর আজকের এই অফিসিয়াল নাম ' **Koninkrijk der Nederlanden'** = The Royal Netherlands' আসে। যার অর্থ দ্বারায় বৃক্ষ দ্বারা আবৃত নীচু ভূমি। পশ্চিম ইউরোপের এই সমতল ভূমির মোট আয়তন ৪১,৫২৬ বর্গ কি,মি, যার মধ্যে প্রায় ৩৩,৮৮২ বর্গ কি,মি, স্থল আর বাকীটা জল। বাংলাদেশের মোট আয়তনের (১৪৪,০০০ বর্গ কি,মি,) প্রায় তিন ভাগের একভাগ। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ঘন বসতির এই দেশটিতে প্রতি বর্গ কি, মি, এ প্রায় ৩৮৯ জন লোকের বসবাস। ২০০৬ সালের হিসাবনুযায়ী দেশটির মোট জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ষোল মিলিয়ন। দেশটির একটি বিরাট অংশ সমুদ্রের নীচ থেকে পাওয়া। উত্তর সাগর এর পাশে এই দেশটির নীচু সমতল ভূমির দেশ হিসাবেই প্রধান পরিচয় যার দক্ষিন - পূর্বদিকে কিছুটা পাহাড় আছে। সবচেয়ে নীচু জায়গাটি প্রিন্স আলেকজান্ডারপোলডার (Prins Alexanderpolder), সমুদ্র থেকে -৬ মিটার নীচে যার অবস্থান আর সবচেয়ে উচু পাহাড়টি ফালসেবার্গে (Vaalseberg) অবস্থিত যার উচ্চতা ৩২২,৫ মিটার। ঝড়ো বাতাস আর জলোচ্ছাস উত্তর দিক থেকে মাটি ভেঙ্গে নিয়ে দক্ষিনে জড়ো করার কারণে এই পাহাড়ের উৎপত্তি। এ ছাড়া বন্যা উত্তর দিকের মাটি সরিয়ে নিয়ে দক্ষিনে জমা করার ফলে দেশের দক্ষিন দিকের মাটিতে পলি পড়ে, সেখানের মাটি অনেক বেশী উর্বর। নদীমাতৃক বাঙ্গলাদেশের মতোও এ পুরো দেশটি জুড়ে রয়েছে নদী, খাল - বিল, হ্রদ আর সমুদ্রতো আছেই এর উত্তর পশ্চিম পাশ জুড়ে। প্রধান নদীগুলোর মধ্যে রাইন, ওয়াল, স্কেলডে এবং মাস এর নাম উল্লেখযোগ্য। হাজার বছর আগের সামুদ্রিক জলোচ্ছাস দেশটির কিছু অংশকে মূল ভুমি থেকে বিচ্ছিন করে ফেলেছিল, 'Friesland' তারমধ্যে একটি। আর বন্যার কারণে দেশের অন্যান্য দ্বীপগুলির মধ্যেও যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সময়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য ছিল। অনেক সময় দেখা যেতো 'Schagen' থেকে বাস্পচালিত ট্রেন আর নৌকা পেরিয়ে 'Wieringer' দ্বীপটিতে পৌছতে সময় লাগত তখন প্রায় পুরোদিন।

সঙ্কটেরই বিহ্বলতা নিজেরই অপমান

সঙ্কটেরই কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মান।

রবি ঠাকুরের এই কবিতাটি ছিল হয়তো বাঙ্গালীদের জন্য, কিন্তু কবিতাটিকে সার্থক রুপ দিয়েছেন এরা।

উত্তর সমুদ্রের কাছে অবস্থান হওয়ার কারণে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, টর্নেডো, প্রচন্ড বেগে ঝড়ো বাতাস, জলোচ্ছাস, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এই দেশটির নিত্যদিনের সাথী ছিলো। অশান্ত রাইন আর মাস আর তার সাথে আরো অশান্ত সমুদ্র যখন দিনের পর দিন দেশটিকে তছনছ করে দিচ্ছিল তখন সবাই ভাবতে লাগল কি করা যায়, কি করে এর হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়? এরমধ্যে ১১৩৪ সালে, ১২৮৭ সালের ঝড় উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধন করে, ১২৮৭ সালের ঝড়ে প্রায় ৫০,০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে আর ক্ষয় - ক্ষতির পরিমান ছিল অগনিত। ১৪২১ সালের সেন্ট এলিজাবেথ বন্যায়ও প্রচন্ড ভূমি ধস ঘটে নেদারল্যান্ডসে। বন্যা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা সে সময়ের মানুষ গ্রহন করেছিলেন, প্রথম শতাব্দীর মানুষেরা নিজেরা উচু টিলা তৈরী করে তার উপর গ্রামের পত্তন করেছিলেন এবং চাষের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই টিলা গুলোকে ‘Terps' বলা হতো। তার সাথে সাথে অনেক জায়গায় পানির তোড়কে বাধা দেয়ার জন্য ছোট ছোট ড্যাম (বাধ) বানানো হচ্ছিল। পরের দিকে এই ‘Terps' গুলোকে ড্যামের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় সরকার ‘Water Bodies' এবং ‘ High Water Council' নামে দুটি সংগঠন তৈরী করেছিলেন যাদের কাজ ছিল পানির উচ্চতা, চাপ তদারকী করা এবং বন্যার উপর নিয়ন্ত্রন রাখা। সে সমস্ত সংগঠনগুলো আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও ঠিক একইভাবে একই কাজ করে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে মাটির স্তর নীচে নামছিলো বলে ড্যাম গুলোকে আরো উচু করা হচ্ছিল। তেরশ শতাব্দীতে যখন উইন্ডমিলের ব্যবহার আরম্ভ হলো তখন উইন্ডমিলের শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের নীচের জমিগুলো থেকে পানি বাইরে বের করে দেয়া হতে লাগল। পরে অবশ্য উইন্ডমিলের সাহায্যে লেক শুকানো, পোলডার বানানোর মতো আরো বহু কাজও করা হয়েছে। কিন্তু ঝড় - ঝঞ্ঝায় লোক ক্ষয়, সম্পদের ক্ষয় হতেই থাকলো। প্রকৃতিকে এতো সহসা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হলো না। বিভিন্ন জায়গায় উচু উচু ড্যাম আর পোলডার বানানোর কাজ হয়েই যাচ্ছিল। যে ড্যামগুলো বানানো ছিলো সেগুলোকে আরো উচু করা হচ্ছিলো। বিভিন্ন জায়গার ‘Terps' গুলোকেও ড্যামের সাথে যোগ করে দিয়ে বন্যা প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু ফলাফল আশানুরুপ ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সমুদ্রে বাধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রনের একটা স্থায়ী সমাধান সবাই মিলে চাচ্ছিলো। কিন্তু কি করে বাধ দেয়া যায় আর বাধ দেয়ার পরিনতি কি হতে পারে তা নিয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা কেউ নিশ্চয় করে দিতে পারছিলো না। পরিপূর্ণ পরিকল্পনার অভাবে শুধু আলোচনা আর ড্যাম -পোলডার বানানোর মাঝেই বন্যা প্রতিরোধের কাজ আবদ্ধ ছিল। এক এক জন এক এক ধরনের পরিকল্পনা জমা দিচ্ছিলেন, যাদের বেশীরভাগই কারিগরী ও প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা আর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। ১৬৬৭ সালে প্রকৌশলী হেন্ডরিক স্টেভিন সর্বপ্রথম মোটামুটি সুনির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা জমা দেন সমুদ্রের মাঝে বাধ দিয়ে উত্তর পাশকে দক্ষিন পাশ থেকে আলাদা করে দেয়ার, দক্ষিন পাশকে সর্ম্পূন রুপে বিলোপ বন্ধ করে দেয়ার। যদিও তার পরিকল্পনা নিয়ে কেউ কোন কাজ করেনি। ১৮২৫ সালে এতো বড়ো ঝড় হয় যে উত্তর হল্যান্ড, ফ্রিসল্যান্ড আর ওভারআইসেল সম্পূর্ণ পানির নীচে তলিয়ে যায়। কিন্তু সে সময়েই ‘সমুদ্রে বাধ দেয়া হবে কোন একদিন' এ পরিকল্পনা নিয়ে সরকার আলাদা একটি সঞ্চয়ী খাত খুলেছিলেন যেখানে অনেকেই তাদের এই দুঃখ একদিন ঘুচবে, তাদের সন্তানরা সুখের মুখ দেখবে এই আশায় সরকারের কাছে এইখাতে পয়সা জমা দিতেন, কিন্তু একটা অল্প সময় পরে এই শৌখিন পয়সা জমা দেয়া পরিবর্তন হয়ে ‘কর' এ রুপান্তর হলো। আয়নুযায়ী কর দিতে হতো কিন্তু তারও একটা সর্বোচ্চ এবং একটা সর্বনিম্ন মাত্রা ছিলো। আর এ কর উপকূলবর্তী এলাকার লোকজনের জন্য শুধু বাধ্যতামূলক ছিলো না, ছিলো দেশের সবার জন্য বাধ্যতামূলক। তৎকালীন রানী উইলমিনাও সমুদ্রে বাধ দেয়ার পক্ষে সারা দেশে অনেক প্রচারনা চালিয়েছেন, দেশের জনগণকে আশার আলো দেখিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, আর সংসদকেও এ ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার তাগাদা দিয়েছেন।

প্রকৌশলী ডক্টরেট কর্নেলিস লেলি (১৮৫৪ - ১৯২৯) তার পরিপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে সমুদ্রে বাধ দিতে শক্তভাবে এগিয়ে এলেন। ১৮৯১ সালে লেলি তার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেন। তিনি আট রকমের কারিগরী পরিকল্পনা আকেন যেখানে তিনি দক্ষিন সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলার সব রকমের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এরজন্য তিনি নিজে সমুদ্রে ড্রিল করে, সেখান থেকে মাটি তুলে গবেষনা করেন। তিনি উত্তর হল্যান্ড আর ফ্রিসল্যান্ডের মধ্যে প্রায় ৩৫০,০০০ হেক্টর জায়গার উপর বাধ দেয়ার কথা বলেন। লেলির পরিকল্পনায় দেখানো হয় ১২০,০০০ হেক্টর পানি ভিতরে থাকবে যেগুলো সময়ের সাথে মিষ্টি পানিতে রুপান্তরিত হবে। এরপর প্রধান সমস্যা হয়ে আসে অর্থনৈতিক সামর্থ্য। প্রায় ১৫০ বছর ধরে টাকা জমিয়ে, কর আদায় করেও যথেষ্ঠ পরিমান টাকা জমা হয়নি বাধ দেয়ার জন্য। কি করে খরচ সংকুলান করা যায় তার জন্য পথ খোজা হতে লাগল। তখন ঠিক হলো অনেকেই বিনা পারিশ্রমিকে তাদের অবসর সময়ে বাধের কাজে সাহায্য করবে। এরমধ্যে বয়োজোষ্ঠ থেকে বেশ অল্পবয়সী ছেলেও ছিল। সে সময় মেয়েরা বাইরে কাজ করতেন না বিধায়, বাইরের কাজে সাহায্যে তাদের কোন ভুমিকা ছিলো না। যে যে কাজ পারবেন, সে সেই কাজ করবেন কিংবা কাজ শিখিয়ে দেয়া হবে এই পরিকল্পনা ঠিক হলো। এভাবে পারিশ্রমিক থেকে কিছুটা টাকা সাশ্রয় করার পরিকল্পনা করা হলো। আর একবারে পুরো বাধের সম্পন্ন করতে না পারলে আস্তে আস্তে টাকা জমিয়ে তা করা হবে সেই কথা ভাবা হলো। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের কারণেও কাজ শুরু হতে দেরী হলো। কিন্তু এবার বাধা পড়ল সম্পূর্ণ অন্য জায়গা থেকে। জেলেরা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন, সমুদ্রে বাধ দেয়া হলে, তাদের মাছ ধরার সমস্যা হবে, সমুদ্র শুকিয়ে গেলে মাছ ধরবে কোথায়, তাদের কি হবে? মাছ ধরা অনেকের পৈত্রিক পেশা তাছাড়া অনেকে মাছ ধরা ছাড়া অন্য কোন কাজ জানেন না। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার বেশীর ভাগ লোকের জীবিকাই সমুদ্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে আর দেশবাসীও তখন ভাবতে বসল মাছের কি হবে? সরকারী তরফ থেকে তখন জেলেদের জন্য পূর্ণবাসন পরিকল্পনার কথা ভাবা হলো। জেলেদের বলা হলো তাদের অন্য পেশায় যেতে সাহায্য করা হবে, তাদের যা ক্ষতি হবে সেটার ক্ষতিপূরন দেয়া হবে আর যারা কোনভাবেই নিজের বাসস্থান আর পেশার পরিবর্তন করতে চান না তাদেরকে বাধ দেয়ার পর উত্তর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য পরিপূর্ণ সাহায্য করা হবে। সমুদ্রে বাধ দেয়ার পর দেখা গেলো ভিতরের সমুদ্র বা দক্ষিন সমুদ্রের অবশিষ্টাংশের পানি মিষ্টি হয়ে গেছে প্রাকৃতিক ভাবেই, আর সেখানে নতুন ধরনের মাছও জন্মেছে। যেগুলো খেতে বেশ সুস্বাদুও বটে। মিষ্টি পানির মাছও দেখতে দেখতে পুরো দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। জেলেদের আক্ষরিক অর্থে তেমন দুঃখ কষ্ট আর পোহাতে হয়নি। এরমধ্যে ১৯১৬ সালে প্রচন্ড বন্যা হয় উত্তর নেদারল্যান্ডসে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়, যার জন্য ১৯১৮ সালের ১৪ই জুন পার্লামেন্টে ‘দক্ষিন সমুদ্র বিষয়ক আইন’ নামে একটি আইন তৈরী করা হয়, লেলির পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে খাদ্য সংকট তৈরী হয়েছিল সেটা থেকে পরিত্রানের জন্যও নেদারল্যান্ডসবাসীদের আরো চাষের জমির প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেও লেলির প্রস্তাব আরো গুরুত্ব পায়। সমুদ্রের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবল অসুবিধা কাটিয়ে উঠে দ্রুত এবং সহজ যোগাযোগের সুবিধা ছিল লেলির পরিকল্পনার আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ১৯১৯ সালে শুরু হয় বাধ কিভাবে দেয়া হবে সেই কাজের পরিকল্পনা, প্রথমে পোলডার তৈরী করা যার ফলাফল হবে (দক্ষিন) সমুদ্রের কিছু অংশ শুকিয়ে ফেলা এবং পরবর্তীতে বাধ দেয়া।

সমস্ত বাধা কাটিয়ে অবশেষে ১৯২০ সালে বাধ তৈরীর কাজ শুরু হয়। পাচ বছর কোন বিরাম ছাড়া হাজার হাজার বেতনভুক্ত আর অবৈতনিক শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯২৪ সালে সমুদ্রে প্রথম ছোট ড্যাম বসানোর চেষ্টা করা হয় পশ্চিম পাশে ‘Van Ewijcksluis' নামক জায়গাটিতে। যদিও এই চেষ্টা ছিলো পরীক্ষামূলক কিন্তু ছিলো প্রকৃত কাজেরই অংশ। এই চেষ্টায় দেখা গেলো ইঞ্জিনিয়ারদের চিন্তা ও হিসাব সঠিক ছিলো না। তারা ভেবেছিলো সমুদ্রের মাটি এই ওজনের ড্যামকে ধরে রাখতে পারবে। ‘Van Ewijcksluis' ঘাসের চাপড়া দ্বারা আচ্ছাদিত একটি ভূমি ছিলো, এই ভূমি ড্যামের ওজন নিতে পারল না। ড্যামটি আস্তে আস্তে নীচের দিকে ডেবে যেতে লাগল আর পাশের জমি উচু হয়ে এক ধরনের নতুন প্রাকৃতিক জলাভূমির তৈরী হলো। সব ইঞ্জিনিয়াররা মিলে ড্যামকে মাটিতে বসানোর

জন্য অনেক ধরনের চেষ্টা করলেন। সব রকমের প্রচেষ্টা শেষে যখন তারা উপায় খুজে পেলেন তখন তাদের কাজ বন্ধ করে দিতে হলো, কারণ ড্যাম বানানোর বাজেট শেষ হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাদের এই হিসাবের ভুলের জন্য ড্যাম বানানোর কাজ আপাতত স্থগিত হলো। ১৯২৬ সালে ছোট খাটো একটা ড্যাম বসানো হলো অস্থায়ী ভাবে। ২,৫ কিলোমিটার জায়গা বন্ধ করা হলো, ড্যামটির নাম হলো Amsteldiepdijk'. Dijk = Dam. বিশ্বজোড়া আজ যে ‘Dijk' শব্দটা ব্যবহৃত হয় সেটা ডাচদের কাছ থেকে আসা। এই বাধটি দেয়ার ফলে ‘Weiringen' আর দ্বীপ রইলো না, মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত হয়ে গেলো। তারপর উইন্ডমিলের সাহায্যে শুরু হলো Weiringen কে শুকানোর পালা। প্রায় সাড়ে ছ'মাস দুরকমের পাম্প দিয়ে অবিরত শুকানোর পর Weiringen বেশ শুকিয়ে গেলো। একটি ছিল বিদ্যুৎ চালিত পাম্প, যেটি তিনটি উইন্ডমিলের সমন্বয়ে গঠিত আর প্রতি মিনিটে প্রায় ৪০০ কিউবিক মিটার পানি বের করতে পারে আর একটি ছিল ডিজেল চালিত পাম্প যেটির ক্ষমতা ছিল প্রতি মিনিটে প্রায় ২৫০ কিউবিক মিটার। বাধের উপাদান হিসাবে ছিল উইলো গাছের গুড়ি, প্রাকৃতিক ভাবে যতো উইলো গাছের গুড়ি তাদের ছিল তা এক সময় আর বাধের জন্য যথেষ্ঠ না বলে, আলাদাভাবে মধ্য নেদারল্যান্ডসে জমি নিয়ে উইলো গাছের চাষ করা হলো। দস্তার পাত সমুদ্রের নীচে স্থাপন করা হলো, ড্যামটাকে মজবুত করার জন্য। প্রথমে তারা বালি আর এটেল মাটির মিশ্রন দিয়ে বাধ দেবেন ভেবেছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো সেটা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য। সমুদ্রের মাটি সে ওজন নিতে পারছে না, ড্যাম বসে যাচ্ছে। তাই বালি আর মাটির মিশ্রনটাকে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ও আরো উন্নত করতে করতে তারা একসময় আর একটি নতুন মাটি তৈরী করলেন যা ২,৬৪ মি,মি এর মাপের টুকরো আকারে তৈরী করা হলো। এই মাটিটি অনেক বেশী ওজন পানির মধ্যে নিতে পারে আর পানির মধ্যে বসেও দারুনভাবে। এই মাটির নাম হলো ‘Kleileem'. দি হেগ এর ‘দক্ষিন সমুদ্র প্ল্যানিং’ অফিসের পিছনের বাগানে প্রথমে এটির পরীক্ষা নেয়া হলো, পরীক্ষা নেয়া ছিল একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেলো বাধের জন্য এটিই সবচেয়ে উন্নত উপাদান।

ড্যাম বানানোর একটা প্রচন্ড প্রভাব পড়েছিল সে সময়ের ডাচ অর্থনীতিতে। সারাদেশ থেকে লোক তখন সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে কাজের জন্য ভীড় জমাচ্ছিলো। সেটা অর্থনীতির জন্য ভালো হলেও উপকূলে বসবাসকারী আদি বাসিন্দাদের মনে বেশ অসন্তোষের সৃস্টি করছিল কারণ উপকূলে বসবাসকারী লোকদের আলাদা এক ধরনের ভাষা (Dialect), সংস্কৃতি, জীবন - যাপনের রীতি - নীতি ছিল যা অন্য প্রদেশের মানুষের মিশ্রনে অনেকটাই উধাও হয়ে গেলো। তখন ইচ্ছে করলে সেদিকের লোকেরা সারা দেশের লোকের বিপক্ষে যায় এমন পদক্ষেপ ও নিতে পারতেন, নিজেদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য, কারণ তখন আর তারা কোন পশ্চাদপদ জনবিচ্ছিন্ন নিরিবিলি দ্বীপের মানুষ নন। অনেক লোকের সমাগমে উপকূলবর্তী এলাকা তখন সরগরম। আজকেও কেউ যদি ভাবে ত্রিশ কিলোমিটার লম্বা একটি বাধ বানানো হবে সমুদ্রের মাঝ দিয়ে , যার জন্য কোন যন্ত্রপাতি নেই, সমস্ত কাজের জন্য শুধু মানুষের দুটি হাতই সম্বল। মাটি টেনে আনা, মাটির গাথুনি গাথা, মাটি বসানো, পাথর টেনে আনা, পাথর বসানো সবই শুধু হাতেই করা হয়েছিল। সততা, একতা, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস মানুষকে যে সব অসাধ্য সাধন করায় এই ড্যামটি তার প্রমান। বিশেষ করে ১৯৩০ সালের পরে যখন অর্থাভাবে ড্যাম বানানোর প্রকল্পটিকে ‘ত্রান প্রকল্প’ হিসেবে ঘোষনা করা হয়। হাজার হাজার মানুষ ড্যাম বানানোর কাজে সাহায্য করার জন্য সেখানে চলে আসেন। সাধারণ কর্মচারীরা কর্মজীবি আবাসস্থল কিংবা সারিবদ্ধ বাড়িতে বসবাস করতেন এখনও কিছু কিছু সে সমস্ত বাড়ি সেখানে রয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রকল্পের কাজে অসংখ্য প্রকৌশলী আর ফোরম্যানও জড়িত ছিলেন, তাদের জন্য প্রচন্ড বিলাসবহুল চারটি প্রাসাদোপোম বাড়ি চারটি দ্বীপে নির্মান করা হয়। তারা তাদের পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস করতেন এবং সেখান থেকেই কাজ পরিচালনা করতেন। এগুলো ছিল তাদের বাসস্থান ও কর্মস্থান। তাদের এই বাস স্থানের একটি আজও 'Oosterland' এ ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যাতে প্রায় ৭০টি শয্যা পাতা আছে। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রাচুর্য তাদেরকে কোন ধরনের অহমিকায় নিয়ে যায়নি। অনেক প্রকৌশলীরাই প্রতি সপ্তাহান্তে দ্বীপবাসীদেরকে এবং ড্যামের কাজের জন্য আসা লোকজনকে নানা বিষয়ে বিনামুল্যে শিক্ষা দিতেন। এরমধ্যে অঙ্ক,

পর্দাথ বিদ্যা, নানা রকম কারিগরী শিক্ষা ও ভূমি পরীক্ষা ছিল অন্যতম। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো Weiringen দ্বীপে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও শুধু এই বিষয়গুলোর উপরই জোর দেয়া হচ্ছে। বিশেষ করে যারা প্রকৌশলীদের কাছ থেকে খুব ভালো করে শিক্ষা অর্জন করছিলেন তারা এই বিষয়গুলোর উপর পাঠদানকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলেন। সেই সময় Weiringen দ্বীপের লোকজন এই বিষয়গুলোতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছিলেন। এর কয়েক বছর পরেই যখন ড্যামের কাজ শেষ হলে প্রকৌশলীরা যার যার নিজের জায়গায় ফিরে যান, দ্বীপবাসীরা শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে বেশ মনক্ষুন্ন হয়েছিলেন।

যাহোক, আবার ১৯২৭ সালে ‘Den Oever' এবং ‘Friesland' এর মধ্যে দিয়ে ড্যাম বানানোর কাজ শুরু হলো। এবার কাজ শুরু হলো আরো জোরেশোরে। যদিও ড্যাম বানানোর জন্য পিলার, স্লুইস গেট ইত্যাদি ১৯২০ সালের দিকেই বানিয়ে রাখা হয়েছিল। এই বাধটি লম্বায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার, আর উচ্চতা ছিল স্থানভেদে ৭,৫ মিটার থেকে ৭,৮ মিটার। এই উচ্চতা ছিল NAP এর উচ্চতা থেকে ৩,৫ মিটার বেশী। (NAP = Normal Amsterdam Peil) এই পরিমাপের একক এসেছে সমুদ্রের সর্বোচ্চ জলোচ্ছাসের উচ্চতা পরিমাপ করে। পরে এই ড্যামটিকে আরো ১০ মিটার উচু করে ডেলটা প্ল্যানিং এর উচ্চতায় নিয়ে আসা হয়। ড্যামটি পানির সমতায় ৯০ মিটার প্রসস্ত। ড্যামটির উপরে একটি গাড়ির হাইওয়ে নির্মান করা হয়, যাতে চারটি লাইনে সারিবদ্ধভাবে গাড়ি চলাচল করে। ১৯৩৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী হাইওয়েটিকে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। পাচ বছর মানুষ আর সমুদ্রের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর অবশেষে জয় হলো মানুষের। ১৯৩২ সালের ২৮শে মে এক শনিবারে মানুষ নিজের স্বাক্ষরতার চিহ্ন একে দিল প্রকৃতির বুকে, সমুদ্রের বুকে, অবশেষে দক্ষিন সমুদ্রের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়ে মাথা উচু করে দাড়াল Afsluitdijk = Closing dam. আর সেখানে জন্ম হলো IJsselmeer = IJssel lake এর. তাৎক্ষনিকভাবে তারা সেখানে ১৬৫০ বর্গ কি, মিটার জমি পুনরুদ্ধার করার ঘোষনা দিলেন। আর IJsselmeer দক্ষিন সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে মূলভুখন্ডের সাথে যুক্ত এক জনপদ হয়ে গেলো। যেখানে সমুদ্রকে দেশ থেকে আলাদা করে ফেলা হলো সেখানে একটি মনুমেন্ট স্থাপন করে বড় বড় হরফে লিখে দেয়া হলো ‘A people that lives, builds to its future'. বাধটির মধ্যে ২৫টি স্লুইস গেট রাখা হলো IJsselmeer er সমস্ত পানি বের করে দেয়ার জন্যে। ৩ × ৫ টি গেট রাখা হলো Den Over এর দিকে মুখ করে আর বাকী ২ × ৫ টি রাখা হলো Kornwerderzand এর দিকে মুখ করে। জাহাজ আসা যাওয়া করার জন্যও গেট রাখা হয়েছে। ৬০০ টন থেকে ২০০০ টন মালামাল নিয়ে যেনো জাহাজ আসা যাওয়া করতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বাধ দেয়ার ফলে নেদারল্যান্ডসের উপকূল সীমা ৩০০ কি,মিটার থেকে কমে ৩০ কি, মিটারে চলে এসেছে। ১৯৩৩ সালের হিসাবনুযায়ী তখন পর্যন্ত এই বাধের পিছনে খরচ হয়েছিল ১২০ মিলিয়ন ডাচ গিলডার। ১৯৪৫ সালের ১৭ই এপ্রিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে জার্মান সৈন্যরা আক্রমন করে ড্যামটির দুটি পিলার গুড়িয়ে দেয়, যে পাশের পিলার গুড়ানো হয়েছিল সেই পাশে ড্যামটি সম্পূর্নভাবে পানির নীচে তলিয়ে যায়, আশেপাশের বাড়ি - ঘর, চাষের জমি সব তলিয়ে যায়। সর্বশক্তি নিয়োগ করে ড্যামটি আবার মেরামত করে ১৯৫০ সালে সর্ম্পূন বসবাস উপযোগী করে তোলা হয়। এরপর নেদারল্যান্ডসের প্রতিরক্ষা বিভাগ ড্যামটির সুরক্ষার বন্দনোবস্ত করার পরিকল্পনাকে প্রচন্ড গুরুত্বের সাথে নেয়। যার কারণে উত্তর নেদারল্যান্ডসের Den Helder একটি দুর্গও বানানো হয়েছে। ১৯৩৩ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর যাদের তত্বাবধনে ড্যামটি তৈরী হয় সাফল্যের স্বারক হিসেবে তাদের দ্বারা ড্যামটির উপর একটি মনুমেন্ট স্থাপন করা হয়। তবে জাতীয়ভাবে ১৯৫৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রানী জুলিয়ানা প্রকৌশলী লেলি'র মূর্তি সারা দেশের পক্ষ থেকে সম্মান স্বরুপ ড্যামটির উপর স্থাপন করেন।

Afsluitdijk Monument

Afsluitdijk বানানো ছিল জয়ের দিকে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। তারপর আস্তে আস্তে ১৯৩৬ সালে Overijssel এর দিকে ৫৪ মিটার লম্বা ড্যাম বসিয়ে ১৯৪০ সালে জন্ম হয় "Flevoland" এর, সেখানে মোট জমি উদ্ধার করা হয় ৪৮,০০০ হেক্টর. 1950 সালে ৯০ কি,মিটার লম্বা রিং ড্যাম বসিয়ে ১৯৫৬ সালে জন্ম হয় Oostelijk Flevoland এর. এখানে পাওয়া যায় মোট ৫৪,০০০ হেক্টর জমি। Oostelijk Flevoland এ তৈরী হয় দুটো গ্রাম আর একটি শহর ‘LelyStad = City of Lely'. দেশবাসী পরম মমতায় আর ভালোবাসায় তাদের প্রিয় প্রকৌশলী লেলি’র নামে শহরটির নামকরন করেন। ১৯৬২ সালে LelyStad এ প্রথম বসবাস আরম্ভ করার লক্ষ্যে বাড়ি ঘর নির্মান শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সালে মানুষ সেখানে সত্যিকার অর্থে জীবন শুরু করেন। বাইরের পৃথিবীর অনেকেই অবশ্য ভাবেন লেলিস্টাড আসলে জঙ্গল, সেখানকার লোকেরা জঙ্গলে বসবাস করে। কিন্তু সেখান রয়েছে স্কুল - কলেজ ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল, বাচ্চাদের জন্য হাইটেক পার্ক, ডাচ টেলিভিশন সেন্টার, অসংখ্য সফটওয়্যার ইন্ডাস্টি। আজকের প্রাচুর্যময় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন জীবন যাপন পদ্ধতি দেখলে ভাবাই দায় মাত্র ৫০ বছর আগে এ সমস্ত কিছুই সমুদ্রে বিলীন ছিল। ১৯৬৮ সালের ২৮শে মে প্রথম মাটির দেখা পায় Zuidelijke Flevoland. এখানে পাওয়া যায় প্রায় ৪৩,০০০ হেক্টর জমি। সেখানে প্রায় ১২,০০০ হেক্টর জমি আলাদা করে রাখা হয় Almere শহর তৈরীর জন্য। ১৯৭৯ সালে Almere শহর তৈরীর কাজ শুরু হয় আর ১৯৮৪ সালে তা শেষ হয়। Enkhuizen থেকে Lelystad এর দিকে ড্যাম বসিয়ে ১৯৭৫ সালে Markerwaard কে শুকানো হয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হয়। ১৯৭৬ সালে ড্যামটিকে যানবাহন চলাচলের জন্য মুক্ত করে দেয়া হয়। ১৯৭৯ সালে Zeewolde শুকানোর কাজ শুরু হয় ১৯৮৩ সালে সেখানে লোকে প্রথম মানুষ বসতি স্থাপন করেন। Weiringen, Flevoland, LelyStad, Dronten, Almere ও Zeewolde নিয়ে ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী গঠিত হয় নেদারল্যান্ডসের বারতম প্রভিনস ‘Provincie Flevoland.' Provincie Flevoland এর

জন্ম আজ আর কোন রুপকথা নয়, এক সাফল্যময় সত্য ও বাস্তব। এভাবে হাজার হাজার কিলোমিটার পানি শুকিয়ে বসবাস, চাষবাস, ও অন্যান্য কাজের জন্য উপযুক্ত করা হয়। সময়ের সাথে সাথে খোলা পানির নর্দমা, উন্মুক্ত পানি গুলো ঢাকা পানির পর্যায়ে ও মাটির নীচের নর্দমার আকার লাভ করে। তবে এই প্রভিনসকে গাছ গাছালি, বাড়িঘর তথা জীবনের রঙ্গের স্পর্শ পেতে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রতি বছর কয়েক হাজার হেক্টর জমিকে চাষের উপযোগী বানানোর প্রকল্প হাতে নেয়া হতো। সমুদ্র থেকে পাওয়া জমির ৭৫ শতাংশ চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, ৮ শতাংশ বসবাসের জন্য আর বাকী অংশ প্রাকৃতিক নৈর্সগ্যের এক অনবদ্য ভূমি হিসেবে। আশেপাশের বহু দেশ থেকে লোকজন এখানে ক্যাম্পিং এ আসেন। প্রায় ৬,০০০ হেক্টর জমি এখানে শুধু প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দৃশ্যের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে যেখানে হাজার হাজার পাখি বিশ্রাম নেয় সারাবছর, তাছাড়া পাখিরা এখানে নিজেদেরকে নিরাপদ অনুভব করে। ১৯৭০ সালের হিসাবনুযায়ী ১৬৫,০০০ হেক্টর জমি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

Afsluitdijk বানিয়ে সমুদ্রকে রুখে দিয়ে নেদারল্যান্ডসবাসীরা যখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন তখন ১৯৫৩ সালে প্রচন্ড বন্যা হলো পশ্চিম দক্ষিন পাশে। এর চেয়ে বড় দুর্যোগ আর কখনও এদেশে আসেনি। দেশের বাইরে থেকে বহু লোক এসেছিল সে সময় নেদারল্যান্ডসকে সাহায্য করতে, তাদের অনেকেই বন্যা প্রতিরোধ কর্মসূচীতেও সাহায্য করছিলেন, তারা বন্যা প্রতিরোধের উপায় বললেন Zeeland প্রদেশকে সমুদ্রকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সমুদ্রকে জমি ফিরিয়ে দেয়া? ‘কখনই না’ উত্তর ছিল নেদারল্যান্ডস সরকারের। অনেক অনেক গবেষনার পর নেদারল্যান্ডসের সরকার ডেলটা প্রজেক্টকে সর্বোত্তম বিবেচনা করে একে দেশের পশ্চিম পাশকে সুরক্ষিত করার জন্য নির্বাচিত করেন। ডেলটাকে নির্বাচিত করার জন্য প্রধান যে কয়েকটি বিষয় কাজ করেছে তাদের মধ্যে ছিল একটি তাদের পুরনো প্রযুক্তি উপকূল সীমাকে কমিয়ে আনা আর একটি উত্তর সমুদ্রের সবচেয়ে দূর্বল সীমাগুলোকে চিহ্নিত করে তার ব্যবস্থা গ্রহন করা। উপকূলের সীমা কমে আসলে পানির সাথে যুদ্ধে তাদের অবস্থান অনেক শক্ত হয়। ২০০০ সাল পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসে জমি কতদূর নীচে বসে যেতে পারে বা কতদূর ক্ষতি হতে পারে সেই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে তারা অনুসন্ধান চালান এবং তারা ড্যামগুলোকে আরো উচু করার জন্য উপদেশ দেন। তাদের হিসাবে প্রতি ১০০ বছরে নেদারল্যান্ডস ১ মিটার করে নীচের দিকে ডেবে যায়। তখনও প্ল্যানিং চুড়ান্ত রুপ নেয়নি, এর পরিবর্তন, সম্ভাবনা সমস্ত খুটিনাটি গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। ১৯৫৮ সালে প্ল্যানিং চূড়ান্ত হয় এবং চির জীবনের জন্য অশান্ত সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। ডেলটা প্ল্যানিং এর বিপক্ষেও বাধা এসেছিল, সেখানকার জেলেরা, পরিবেশ রক্ষাকারী সংগঠন এবং এক বিয়ার কোম্পানী তাদের কারখানায় বাধা পড়ার আশঙ্কায় প্রতিবাদ করেন, পরে সরকার বিয়ার কোম্পানীকে অন্যভাবে পুর্নবাসন করে দেয়। ১৯৫৮ সালেই কাজ শুরু করা হয় যা ২০০২ সালে সাড়ম্বরে শেষ হয়। ডেলটা প্ল্যানের সরকারী লক্ষ্য ছিল পশ্চিম উপকূলের বন্যার সম্ভাবনাকে ১০,০০০ বছরে একবার আর সারা দেশের জন্য ৪,০০০ হাজার বছরের একবার সেই সীমানায় নিয়ে আসা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমুদ্রের ভিতর দিয়ে ৩,০০০ কি,মিটার আর সমুদ্রের বাইরে দিয়ে ১০,০০০ কি,মিটার বাধ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সারা দেশের সমস্ত খাল, নদীকে পাইলিং করে এদের দুপাশ বেধে দিয়ে এদেরকে ডেলটা উচ্চতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং কালনাগিনী সমুদ্রকে বাধ দিয়ে চিরদিনের জন্য Zeeland প্রদেশ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে অনেক ঐতিহাসিক জায়গা রয়েছে বলে সমস্ত জায়গায় বাধ দেয়া সম্ভব হয়নি, তাই ৩২৫ মিটার লম্বা ও ২২ মিটার উচু একটি রাস্তা বানানো হয় পানির মধ্যে দিয়ে, Stroomvloedkering যার নাম। ১৯৮৬ সালে রানী বিয়াট্রিক্স যখন Stroomvloedkering এর উদ্বোধন করতে আসেন তখন সগর্বে বলেন ‘আমরা এখন নিরাপদ, যুদ্ধে আমরা নিশ্চিতভাবে জয়ী হয়েছি’। ২০০২ সালে ডেলটা প্রকল্পকে সরকারীভাবে সমাপ্ত ঘোষনা করা হলেও এর কাজ এখনও চলছে। বিপদ পরিমাপ করার জন্য যে কমিশন কাজ করছে তারা এখনও মাঝে সাঝেই ছোট-খাট সঙ্কটে পড়লে ডেলটার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহন করেন। নেদারল্যান্ডসের ভৌগলিক কারণেই হয়তো কোনদিনও ডেলটার কাজ শেষ হবে না। তবে এ কথাও আজ আর নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না কারণ আজকের নেদারল্যান্ডসের অবস্থান ও আকার মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে কেউ কল্পনা করতে পারেননি। নেদারল্যান্ডসবাসীরা নিজেরাও বলেন, ‘The Netherlands seems safe, but the

fight against water continues.' ডেলটা প্রজেক্টই মানুষের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তৈরী করা একমাত্র সবচেয়ে লম্বা ও বড় নির্মান কাজ। যার কারণে এ্যামেরিকার সোসাইটি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার'সরা একে মর্ডান সায়েন্সের সপ্তম আশ্চর্যের একটির মর্যাদা দিয়েছে।

Flood 1953

অনেকেই ভাবতে পারেন কেনো এর নাম 'ডেলটা' রাখা হলো? গ্রীক বর্ণ "V' এর আদি মানে হলো ডেলটা = তিনটি কোনা, ডেলটার ডিজাইনের সাথেও "V' এর মিল আছে আর এর আক্ষরিক মানে দাড়ায় যেখানে এসে নদী শেষ হয়ে যায়, পরবর্তীতে তাই হয়েছিল কিন্তু এছাড়াও একে ডেলটা নাম দেয়ার অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। বহির্বিশ্বে বন্যা প্লাবিত এই অঞ্চলটি 'The Dutch Delta' নামেই পরিচিত ছিল। তেরটি ভাগে ভাগ করে ডেলটার কাজ সম্পন্ন করা হয়। Hollands IJssel 1958, De Zandkreek 1960, Het Veerse - Gatdam, De Grevelingendam, Vokerakdam and Hellagatsplein 1969, Haringsvleitdam 1970, Brouwersdam 1972, Markiezaatskade 1983, Oosterschelde 1986, Oesterdam 1987, Philipsdam 1987. তবে এবার বাধ দেয়ার চিরাচরিত উপাদান দস্তার টুকরো, উইলো গাছের গুড়ি এগুলো বদলে নতুন সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। নাইলন এবং ঘাইটাসফলট ব্যবহার করেছেন তারা কারণ পানির নীচে থাকার জন্য এগুলোর গুনগত মানও অনেক ভালো এবং বেশীদিন পানির নীচে ভালো থাকে। ট্যুরিষ্টরা খুব আগ্রহ নিয়ে ডেলটা ওয়ার্ক দেখতে যান, ডেলটার সাথে সাথে নেদারল্যান্ডসের ভিতরের সীমার চারিদিকে ছড়ানো মনোগ্রাহী নীল সমদ্রে উপভোগ করেন। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যাবে, হয়তো কোথাও না। চারিদিকে টলটলে নীল পানি মাঝখানে সব গাড়ি চলছে সাই সাই শব্দ করে, ১০০ কি, মিটার সে সব রাস্তার সর্ব নিম্ন গতিবেগ। পানি নেদারল্যান্ডসবাসীর আজীবনের সাথী আর সাথে পানির সাথে তাদের যুদ্ধও। সে কারণেই বোধহয় চার বছর বয়স থেকে নেদারল্যান্ডসে বাচ্চাদের সাতার শেখা বাধ্যতামূলক। স্কুলে পড়ার সাথে সাথে সাতারও শেখাতে হবে। সমুদ্র যদিও তার ভয়ঙ্কর ফেনা আস্তে আস্তে অনেক নামিয়ে এনেছে, সে এখন আর ভয়ঙ্কর জেদী কোন বালিকা নয় বরং শান্ত - শিষ্ট কোমল পরিনত এক তরুনী। কিন্তু সমুদ্রকে নিয়ে এদের গবেষনা, কাজ, এখনও শেষ হয় নি। দিনরাত কি করে প্রযুক্তিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়, আরো উন্নত নিরাপদ করা যায় সেই নিয়ে তারা আজো ব্যস্ত। চেষ্টা আর সদিচ্ছা কোন অসম্ভবকেই আর অসম্ভব রাখে না। বিজ্ঞান আজ সব অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে,

সে সমুদ্রে বাধ দেয়াই হোক কিংবা ব্লাড ক্যান্সারকে সারিয়ে তোলাই হোক, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজ্ঞান আজ খরগহস্ত। বিজ্ঞান আজ প্রত্যেক জায়গায় সগর্বে সেই স্বাক্ষর রেখে দিচ্ছে।

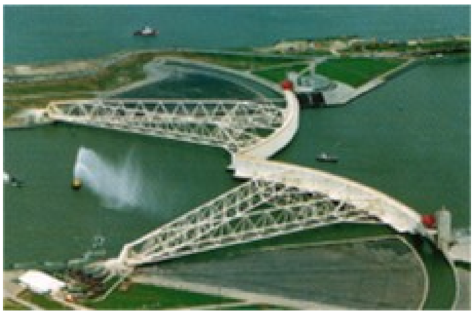

Delta Work

ঝঞ্ঝা কবলিত, বন্যা কবলিত, নীচু সমতলভূমির বাংলাদেশ আজ কোথায় দাড়িয়ে???

নেদারল্যান্ডস আর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গঠন আর বন্যা সমস্যারও অসংখ্য মিল আছে। সেই কারণেই বোধ হয় ডাচ সরকার নিজের আগ্রহে অনুদান প্রকল্প হিসেবে বাংলাদেশে ড্যাম বানানোর জন্য পরিকল্পনা, গবেষনা, গবেষক, কারিগরী সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান করেছনে। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর ডাচ টিভি বাংলাদেশের বন্যা প্রতিরোধের উপায় ও সম্ভাবনা নিয়ে একটি ডকুমেন্টরী দেখিয়েছিল। প্রায় ৬০০ ডাচ ইঞ্জিনিয়ার সেই মূহুর্তে বাংলাদেশে কাজ করছিলেন এই বিষয়ের উপর। তাদের কারো কারো মতামতও তখন টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছিল। তাদের মতানুসারে, বাংলাদেশের যেহেতু ভূমির সাথে সমুদ্রের সীমানা অনেক বড় তাই কয়েক'শ কিলোমিটার লম্বা ড্যাম বানাতে হবে এবং তার জন্য যে পরিমান পয়সা দরকার সেটা জমাতে বাংলাদেশের তিনশ বছরও লাগতে পারে। সেটা অবশ্য ১৯৯৮ সাল থেকে তিনশ বছর বলা হয়েছিল। তারা তাদের ডিজাইন, বাজেট, গবেষনা সব সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন এবং তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যদিও তার কিছুই সাধারণ জনগণ এখনও বিশদভাবে জানতে পারেনি। তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ডাচ টিভির পক্ষ থেকে তারা ইতিমধ্যে যে বাধগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন সেগুলো কেন ভেঙ্গে পড়ছে বা আশানুরুপ ফল দিচ্ছে না? তাদের উত্তর ছিল, বাধ দিয়ে কিছুটা জায়গা শুকিয়ে ফেলা মাত্রই লোকজন এসে সেখানে বাড়িঘর বাধতে শুরু করে, তাতে ড্যাম ডেবে যায়, অথবা ভেঙ্গে পড়ে, সরকারী ভাবে জনগণকে সচেতন করার কোন প্রয়াসই নেই এখানে। বাধের থেকে কতদূরে চাষ করা বা বসবাস করা উচিৎ সেগুলো কিছুই সরকার জনগণকে বোঝান না। বাংলাদেশকে কেউ কি এই টাকা ঋণ হিসেবে দিতে পারে সে কথাও হয়েছিল সেই প্রোগ্রামে, তাতে স্পষ্টভাবে সবাই উল্লেখ করেন এতো টাকা ঋণ দেয়া কখনও সম্ভব না, নেদারল্যান্ডস যেভাবে শত বছর ধরে টাকা জমিয়ে এই দুঃখ ঘুচিয়েছে, বাংলাদেশকেও ঠিক তাই করতে হবে। কিছু সাহায্য হয়তো বিশ্বব্যাংক বা অন্যান্য সংস্থা দিতে পারে, নেদারল্যান্ডস কারিগরী সহায়তা দিবে কিন্তু আগাতে হবে দেশের জনসাধারণকেই, তাদেরকেই বুঝতে হবে বাধের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা। সরকার ডাচ গবেষকদের সামান্য একটু উপদেশ অবশ্য মেনেছেন, বর্ষার আগে আগে নদীতে ড্রেজিং করানো হয় আজকাল। কিন্তু নদীকে গভীর ভাবে ড্রেজিং করে দুপার বেধে দেয়া পর্যন্ত আগান না কখনও, অর্থাভাবে। অতি অবশ্য করণীয় কাজের জন্য সবসময় আমাদের সরকারের অর্থাভাব থাকেই। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ বন্যায় ভেসে যাওয়াই আজ নিয়তি হয়ে দাড়িয়েছে আমাদের। নদীর ভাঙ্গনে হাজার হাজার গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে যায়, লোকজন উদ্বাস্তু হয়ে শহরে ভিড় করে, শুরু হয় চরম দারিদ্র, হতাশা আর অপরাধে জড়িয়ে

পরার নতুন কাহিনী। নেদারল্যান্ডসের ডেলটা ওর্য়াক যতবারই দেখতে যাই, ভাঙ্গা মন নিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করি বাংলাদেশ আজ কোথায়?

তানবীরা তালুকদার
১২।০২।০৭

*** প্রবন্ধটি পূর্বে সাপ্তাহিক ২০০০ এ প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশে প্রতিবার বন্যার এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের মানসে এই প্রবন্ধটি পুনঃ মুদ্রন করা হলো।

তথ্যসূত্রঃ

http://www.xs4all.nl/~dekei/holland.html

http://aqua.obeindhoven.nl/

http://proto.thinkquest.nl/~llb174/onderwerpen/Het%20Zuiderzeeproject.htm

http://www.nationaalarchief.nl/plaatsen/details.asp?actie=zoeken&page=3&pk=3

http://www.pagowirense.nl/wr-his6.asp

http://library.thinkquest.org/C001635F/fdeltawerken1.htm

http://dronten.flevoland.to/geschiedenis/

® Encarta ® - Encyclopedie - Winkler Prins. © 1993-2003 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.